উত্তরপর্ব

এক

সকালবেলাটা হুশ করে কেটে যায়। তারপর দু হপ্তা ছুটি কাটিয়ে ফেরার পরের সোমবারটা তো আরও তাড়াতাড়ি পেরোয়। বুড়ো আর টুবলু তো সেই সাড়ে ন'টাতেই বেরিয়ে গেছে। বৌমাও একটু ব্যাঙ্কে গেছে। সীমা কাজ করে চলে গেছে। ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। চশমাটা হাতে নিয়ে মায়াদেবী বাইরের ঘরে এলেন। সুতপার বাড়িতে বেশ হইচই করে এসে এখন একলা ঘরে তো ফাঁকা লাগবেই। বাইরে গিয়ে একবার উঁকি মারলেন মায়াদেবী। দশরথ বাগানটা পরিষ্কার করছে। দু সপ্তাহেই এত আগাছা হয়ে গেছে! সুতপার মেয়েটা ভারি মিষ্টি হয়েছে। টিকলি। টুবলুটাই বা কম কিসের। নাতি নাতনি দুজনেই ঠাকুমা অন্ত প্রাণ। এটা মায়াদেবীর একটা গর্বের জায়গা। কাগজটা পড়া হয়না সকালের স্কুল-অফিসের হুড়ুম দুড়ুমে। এটাই মায়াদেবীর প্রত্যহিক কাগজ পড়ার সময়। আজকাল সময় কাটানো একটা সমস্যা হয়ে গেছে। টুবলুটা ছোট থাকতে ওর পেছনেই অনেকটা সময় কেটে যেত। এখন একটু বড় হয়েছে। স্কুল, খেলাধুলো - পুরো দিনটাই তো বাইরে। আর সন্ধেবেলায় পড়তে বসা। কাগজেও আজকাল খবর থাকে না। পাতাভর্তি খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি। সময়টা বড্ড খারাপ। টুবলুরা যখন বড় হবে তখন যে কোথায় দাঁড়াবে সমাজটা।
'মা!'
কাগজ থেকে মুখ তোলেন মায়াদেবী। দরজায় দশরথ দাঁড়িয়ে। ঘর্মাক্ত, বিস্ফারিত চোখ।
'কি হল দশরথ? কি হয়েছে?'
'একটা হাত - বাচ্চার'
'মানে?', উঠে দাঁড়ান মায়াদেবী। দশরথ বসে পড়ছে দরজার পাল্লা ধরে।
'বাগানে, ঝোপের মধ্যে একটা হাত, বাচ্চার, কাটা - '

***

হাত মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেড়িয়ে এল প্রশান্ত। মমতা খাবার বাড়ছে। অফিসে এই সময়টা খুব কাজের চাপ থাকে। রোজই ফিরতে ফিরতে দশটা বাজছে। খিদেও পেয়ে গেছে।
'এসো, খাবে এসো।' টেবিল থেকে ডাকল মমতা।
'পুতুন শুয়ে পড়েছে?'
'হ্যাঁ। সারাদিন অত হুটোপুটি করলে আর জেগে থাকতে পারে?'
দুটো রুটি তুলে নিল প্রশান্ত হটপট থেকে।
'আজ এদিকে তো বিরাট কান্ড হয়ে গেছে!' প্রশান্তের থালায় তরকারি দিতে দিতে বলল মমতা।
'কি কান্ড?'
'ওই যে গলির মুখে চক্রবর্তীদের বাড়িটা আছে না? ওদের বাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।'
'চক্রবর্তী - মানে সুদীপবাবুদের বাড়িতে?'
'হ্যাঁ গো। সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে'
'বাড়ির মধ্যে থেকে লাশ পাওয়া গেছে?'
'না, বাড়ির মধ্যে না। বাগানে। তিন - চার টুকরো করে পুঁতে রেখেছিল।'
'তরকারিটাতো বেশ ঝাল হয়েছে। পুতুন খেয়েছে?' আঙুল চাটতে চাটতে বলল প্রশান্ত।
'হ্যাঁ, একটু হুস্-হাস্ করছিল - খেয়ে তো নিল। এখন বড় হয়েছে না।'
আরেকটা রুটি নিল প্রশান্ত।
'কাল কি যেতে হবে বাজারে? না করা আছে?'
'না, কাল হয়ে যাবে। রুই মাছটাও আছে দু টুকরো। পুতুনের জন্যে ডিমের ঝোল করে দেবো। কাল সকালে একটা পাঁউরুটি নিয়ে এসো। বিকেলে মল্লিকা আসেনি বলে আনিয়ে রাখা হয়নি।'
'আজ আবার কামাই করেছে?'
'বিকেলে নাকি ওদের পাড়াতে পুলিশ এসেছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে, তাই আসেনি। খবর পাঠিয়েছিল।'
'ওই লাশটার ব্যাপারে নাকি?'
'হ্যাঁ'
'কার লাশ? পুলিশ ধরেছে কাউকে?'
'হ্যাহ্ পুলিশ এতো তাড়াতাড়ি সব রহস্য উদ্ধার করলেই হয়েছে! তবে লাশ শনাক্ত হয়েছে।'
'তাই নাকি?'
'রাজাবাগানের এক বাড়ির মেয়ে', খাওয়া শেষে বাসন গুছোতে গুছোতে বলল মমতা, 'মেয়েটা নাকি গত তিন-চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। পুলিশে ডায়েরিও করেছিল ওরা।'
'তিন চার দিন আগে খুন করে রেখে গেছে আর কেউ টের পায়নি?' মুখ ধুতে ধুতে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।
'পুলিশ বলছে লাশটা নাকি টাটকা - বড়জোর দু দিন হবে।'
'তুমি এত খবর পেলে কোত্থেকে?'
'মল্লিকা - আবার কোত্থেকে! পাড়ার খবরের তো ওই যোগানদার। টিভিতেও দেখাচ্ছে দুপুর থেকে।'

'রান্নাঘর থেকে আসার সময় একটা জলের বোতল নিয়ে এসো তো', একটা সিগারেট ধরিয়ে টিভিটা চালাল প্রশান্ত। কার্টুন হচ্ছে। পুতুন দেখছিল বোধহয়। স্পিনাচ খেয়ে শক্তিমান হয়ে পপাই ঠেঙাচ্ছে ব্লুটোকে। বেশ মজাদার লাগে পপাইকে। চ্যানেল ঘোরাল প্রশান্ত। খবর। পাড়ার খবরটাই দেখাচ্ছে। জল নিয়ে মমতা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।
'সুদীপবাবুদের কিছু করেছে নাকি পুলিশ?', জিজ্ঞেস করে প্রশান্ত।
'না। ওরা তো বাইরে গেছিল। কালই ফিরেছে। আজ বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে এই ব্যাপার।'
টিভির পর্দায় একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি ভেসে ওঠে। শম্পা ভদ্র। বয়স সাত।
'ওদের বাড়িটাও নাকি সুবিধের নয়', টিভির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে মমতা।
'কাদের? এই ভদ্রদের?'
'হ্যাঁ। মেয়েটার বাবার নাকি ইদানীং হঠাৎ করে খুব টাকা হয়েছিল।'
'দু-নম্বরী কারবার ছিল নাকি।'
'হবে হয়তো। ওসবেরই ফল ভুগছে এখন। গেল তো মেয়েটা।'
স্থানীয় লোকদের মতামত নিচ্ছে টিভি সাংবাদিক।
'এ আমাদের সরকার বৌদি না?'
'হ্যাঁ, সবাই তো ভিড় জমিয়েছিল টিভিতে মুখ দেখানোর জন্যে।'
চ্যানেল পাল্টালো প্রশান্ত। উত্তেজিত সরকার বৌদির মুখের জায়গায় চলে এল লাস্যময়ী নর্তকী।

***

সারাটা দিন অনর্থক ধকল গেল। যা দিনকাল পড়েছে, দু দিন নিশ্চিন্তে বাইরে যাবার উপায় নেই। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি সুদীপরা শোয় না। কিন্তু আজ সারাদিন যা গেল, পুলিশ, টিভি, রিপোর্টার - সবাই ক্লান্ত। ভাগ্যিস মীরা টুবলুকে খোকানদাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছোটঘরে টুবলু এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মীরাও শুয়ে পড়েছে। সিগারেটটা নিভিয়ে সুদীপ একবার মার ঘরে উঁকি দিল। মার উপর খুব স্ট্রেস গেছে। কেমন যেন থমকিয়ে গেছে মা-টা।
'কি গো ঘুমোওনি এখোনো?'
খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসেছিলেন মায়াদেবী। সুদীপ কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
'শরীর খারাপ লাগছে?'
'না রে, তবে ঘুম আসছে না।'
'সব তো মিটে গেছে। আর চিন্তা কোরোনা।'
'হ্যাঁ', একটা বড় শ্বাস ফেললেন মায়াদেবী, 'চিন্তা কি আমার বশ রে, ওই টুকু মেয়েটা - '
'সত্যি মানুষ কত নিচে নেমে গেছে। এরকম লোকের ফাঁসি হওয়া উচিত।'
'তাতে কি আর মেয়েটা ফিরে আসবে?'
চুপ করে রইল সুদীপ। প্রথম ধাক্কাটা মা-ই পেয়েছে। শকিং তো বটেই।
'যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন ওই ভাবনাগুলো মাথা থেকে না সরালে আবার শরীর খারাপ হবে।'
মায়াদেবী কোনো উত্তর দিলেন না।
'দুপুরে তোমার যে আনচান লাগছিল, ওটা কমে গেছে তো পুরোপুরি?'
'হ্যাঁ'
'কালকে আমি অফিস যাওয়ার পথে বাসুকে বলে যাব ও এসে একবার প্রেসারটা চেক করে যাবেখন।'
'আচ্ছা'
সুদীপ খাটে বসে মার পিঠে একটা হাত রাখল।
'মা, এবার একটু শোবার চেষ্টা কর। অনেক ধকল গেল সারাদিন। না ঘুমুলে শরীর খারাপ হবে।'
'কাল টুবলুকে স্কুলে পাঠাসনে বুড়ো।'
'কিন্তু মা, কাল আবার পুলিশ আসবে, রিপোর্টার আসবে - টুবলু ঘরে থাকলে ওর মনে অহেতুক চাপ তৈরি হতে পারে।'
'হ্যাঁরে আমাদের সাথেই কেন এরম হল?'
'কিছুই তো হয়নি মা। আমাদের তো কিছু হয়নি। পুলিশ কতো সহযোগিতা করেছে বলো তো? কাউকে হ্যারাস করেনি, উল্টে রিপোর্টারদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তুমি চিন্তা না করে শুয়ে পড় মা। সব ঠিক আছে', সুদীপ উঠে দাঁড়াল, 'আজ একটা ক্যাম্পোস খেয়ে নাও ঘুম না আসলে। দেব?'
'দে একটা। না খেলে ঘুম আসবে না'
টেবিলের ড্রয়ার ঘেঁটে একটা ক্যাম্পোস বার করে মাকে দিল সুদীপ। বাধ্য মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নিলেন মায়াদেবী।
'তুই যা, শুতে যা। আমিও শুয়ে পড়ছি।'
আলো নিভিয়ে, দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে আসে সুদীপ।

জানালা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে হালকা চাঁদের আলো। চারদিক নিস্তব্ধ। আজকে পাড়াটা একটু তাড়াতাড়িই সুনশান হয়ে গেছে যেন। কুকুর বিড়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছেনা। শুধু ঘড়ির টিকটিক। সাধারণত নাইটল্যাম্প নিভিয়েই শোন মায়াদেবী। কিন্তু আজ অন্ধকারটা যেন বড্ড বেশি চোখে ঠেকছে। শুয়ে শুয়ে দুবার পাশ ফিরলেন মায়াদেবী। চোখ বুজলেই হাজারটা চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসছে। বুড়োর বাবার এক পিসতুতো বোনের নাম ছিল শম্পা। আরও দুয়েকবার এপাশ ওপাশ করে উঠে বসলেন মায়াদেবী। জানালার পর্দার

ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে অন্ধকার। চাঁদ বোধহয় মেঘের আড়ালে গেছে। খাট থেকে নেমে সবুজ নাইটল্যাম্পটা জ্বালালেন মায়াদেবী। তারপর আলতো করে দরজাটা খুলে বাইরের ঘরে এলেন।ছোটঘরের পর্দা টানা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারলেন মায়াদেবী। টুবলু ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে একটা হাত বুকের উপরে উঠে গেছে। ভিতরে ঢুকে আলতো করে হাতটা পাশে নামিয়ে দিলেন তিনি। দেবশিশু। খাটের পাশের চেয়ারটায় বসলেন মায়াদেবী।

***

সব আলো নিভে গেলে নাইটল্যাম্পের আলোটা রাত্তিরে বড় জোরালো লাগে। সেই আলোতে প্রশান্ত তার স্ত্রীর সাদা রাত্রিবাসের পেছনে লুকিয়ে থাকা বক্ররেখাগুলোর তারিফ করছিল মনে মনে। দেখে মনে হয়না ছ'বছরের মেয়ের মা! মমতা বিছানার এক প্রান্তে বসে মুখে ক্রীম ঘষছিল। পেছন না ফিরেও সে টের পাচ্ছিল প্রশান্তের দৃষ্টির গতিবিধি। তাই আজ ওর প্রসাধন যেন ফুরোচ্ছেই না। প্রশান্তের এই অধীরতাটা উপভোগ করে মমতা।
'হলো তোমার?'
ক্রীমের শিশির ঢাকনাটা লাগিয়ে বিছানায় নেমে আসে মমতা। সবল হাতে তাকে নিজের দিকে টেনে নেয় প্রশান্ত।
'মাস দুয়েকের মধ্যে আমার একটা প্রমোশন হতে পারে', বলতে বলতে মমতার রাত্রিবাসের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় প্রশান্ত। তার গরম নিঃশ্বাসে উত্তেজনা টের পায় মমতা।
'অমিতদা আজ আভাস দিল', ফিসফিসিয়ে বলে চলে প্রশান্ত। তার অস্থির হাতের টানে সরে যেতে থাকে মমতার নাইটি।
'আলোটা নিভিয়ে দিই?' স্বাভাবিক স্বরে বলে মমতা।
'থাক্ না।'
'ধ্যাৎ', হাত বাড়িয়ে বেডসুইচ থেকে নাইটল্যাম্পটা বন্ধ করে মমতা।
রাত্রিবাসের বাধা হটিয়ে প্রশান্তের হাত নেমে আসে নিচের দিকে। নিঃশব্দে সে মুখ গুঁজে দেয় মমতার বুকে। অভ্যাসমতো প্রশান্তকে আঁকড়ে ধরতে ধরতে মমতা বলে ওঠে, 'জানো খুন করার আগে ওরা মেয়েটাকে রেপ করেছিল।'

দুই

মাথাটা এখনও চিড়বিড় করছে অজিতের। হারানদার দোকানে ঢুকে সিগারেট ধরিয়ে একটা চায়ের অর্ডার ছুঁড়ে দিয়ে কোণের দিকে একটা টেবিলে বসল সে। সাদা-কালো টিভিটায় ক্রিকেট চলছে। সামনের টেবিলের ছোঁড়াদুটো চা খেতে খেতে হাঁ করে ম্যাচ গিলছে। সিগারেট টানতে টানতে একটু খেলার দিকে চেয়ে রইল অজিত। দুটো করে বল খেলে পরপর আউট হয়ে ফিরে এল তেন্ডুলকর আর গাঙ্গুলি। শালা এদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই খেলার প্রতি। রান করুক বা না করুক, খেলতে নামলেই তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, তারপরে বিজ্ঞাপনের টাকা। সেটাই তো আসল। এক এক সময় মনে হয় ক্রিকেট খেলাটাও এদের কাছে বিজ্ঞাপনের মতোই, মুখ দেখালেই টাকা। শালা এখনও চা টা দিলনা! আরেকবার হাঁক পাড়ল অজিত। কেউ আজকাল যেন আর তাকে পাত্তা দিচ্ছেনা। সুজিতদাতো একরকম তাড়িয়েই দিল। এমনকি মানসীও কেমন যেন ঠান্ডা মেরে গেছে আজকাল। সবাই শালা ধরে নিয়েছে অজিতের দ্বারা আর কিছু হবেনা। বাড়িতে মা-ই যা একমাত্র এখনো ভরসা করে। আর তাছাড়া কিছু করার উপায়ও তো নেই। বন্ধু-বান্ধবগুলো এক এক করে সবাই কিছু না কিছু জুটিয়ে নিয়েছে। ধুস্ শালা, এক এক সময়ে নিজের ওপর বিরক্তি ধরে যায়। শালা একার চেষ্টায় আজকাল কিচ্ছু হয়না। হয় টাকা নয় খুঁটি দরকার। সুজিতদা একটু সাহায্য করলে এবার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। চাটা বিস্বাদ লাগে অজিতের।
হাজার পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল চৌধুরিবাবু। টাকা ছোঁয়ালেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আর মাস গেলে সাত হাজার টাকা। হাজার কুড়ি অজিত এদিক ওদিক থেকে যোগাড় করেছে। বাকিটার জন্যে গেছিল সুজিতদার কাছে। এই ব্যাপার।
এই চাকরিটা বাগাতেই হবে। অনেক হয়েছে। মরা ইস্কুলমাস্টার বাপের সঞ্চয়ের টাকায় আর বেশিদিন চলবেনা। মানসীর কাছেও এটা একটা প্রেস্টিজ ইস্যু। চৌধুরিরা নতুন প্রাইমারি স্কুলের জন্য লোক খুঁজছে এই খবরটা তো মানসীই এনেছিল। মানসীর দাদার রেফারেন্সে গেছে বলেই মাত্র পঞ্চাশ হাজারে রফা হয়েছে। তার পরেও এটা হাতছাড়া হয়ে গেলে -
মানসীও যে ওর ওপর অধৈর্য হয়ে উঠছে এটা ক্রমশ টের পাচ্ছ অজিত। স্বাভাবিক। বছর পাঁচেক ধরে ওদের প্রেম। দুপক্ষেরই সম্মতি আছে কিন্তু বিয়ে করার মুরোদ হচ্ছেনা। মানসী এখন যেন একটু এড়িয়েও যাচ্ছে অজিতকে। পার্কে বা সিনেমা হলেও একটু ঘনিষ্ঠ হতে গেলেই আজকাল কেমন ঠান্ডা মেরে যায়। কখনো কখনো ঠেলে হাত সরিয়ে দেয়। নিজের ওপর ক্ষোভে হতাশায় ভেতরে ভেতরে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে অজিত।
'কি বে জিতু, কি করছিস?'
চমকে উঠলে অজিত। বাপিদা। সঙ্গে সমর। উত্তর না দিয়ে হাসল সে। এগিয়ে এসে সামনের টেবিলটায় বসল ওরা।
'কত রান হল -', বলে টিভির স্কোরটার দিকে চোখ বুলিয়েই গালাগাল দিয়ে উঠল বাপিদা, 'শালা বাঞ্চোৎগুলো বিজ্ঞাপন করে করে রান করাটা ভুলে গেছে।'
এরা হারানদার নিয়মিত সান্ধ্য খদ্দের। অজিতদের দলটাও একসময় ছিল। এখন সব চাকরি বাকরি নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র অজিত ছাড়া আর কেউই নিয়মিত আসেনা এখন।
টিভিতে খেলার সম্প্রচার বন্ধ করে সান্ধ্য খবর শুরু হয়েছে।
'কি রে জিতু কিছু হল চাকরি বাকরির? কিছু কর এবার।' সিগারেট ধরিয়ে বলে বাপিদা।
'চেষ্টা করছি।' বিরক্তি চেপে হাসল অজিত। সবাই বলছে কিছু কর, কিন্তু কিছু করার জন্য সাহায্য চাইলে সবাই পিছিয়ে যায়। শালা চাকরির জন্যে সবার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

‘কাল বিকেল থেকে শালা এই খবরটা নিয়ে চর্চা চলছে’, টিভির দিকে তাকিয়ে বলল বাপিদা।
‘কেউ বলছে মুক্তিপণের জন্য মেরেছে বাচ্চাটাকে, কেউ বলছে ব্যবসায়িক শত্রুতা’, যোগ দেয় সমর।
টিভিতে শম্পা ভদ্রের ছবির দিকে তাকায় অজিত। সুজিতদার মেয়ে নেহার বয়সী হবে মেয়েটা।
‘সম্ভবত পরিচিত কেউই ওকে কিডন্যাপ করেছিল বলে পুলিশের ধারণা।’ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করে সমর।
কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকে অজিতের। আজকাল পরিচিত লোকজন, বিশেষ করে বন্ধু বান্ধবদের সামনে কেমন যেন অস্বস্তি হয় অজিতের। একটা কমপ্লেক্সে ভোগে। এই যে সমর, মালটা ওর শ্বশুরের থুতে চাকরি জুটিয়েছে। কথাটা মাথায় আসতেই সুজিতদার ওপর লাগামছেঁড়া রাগটা ফিরে আসে। সুজিতদার চাকরি হয়েছিল অজিতের বাবার সুপারিশে। এখন অজিত সাহায্য চাইতে গেলে তাড়িয়ে দেয়। শালার ডাইনে বামে দুহাতে রোজগার। তিন বছরে দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে, পিসতুতো ভাইকে তিরিশ হাজার দিতে গেলে গরিব হয়ে যায়! সব শালা ওই বৌদির উসকানি। জানে অজিত। খানকী মাগী - মনে মনে গালাগালি দিয়ে ওঠে সে। পুরো ভেড়া বানিয়ে রেখেছে সুজিতদাকে। নইলে শালার ব্যবসায় লাখ লাখ টাকা ঢালতে পারে আর নিজের পিসতুতো ভাইকে ওই কটা টাকা ধার দিতে পারেনা। সুজিতদার থেকে রাগটা গিয়ে পড়ে রুপ্সা বৌদির উপর। শালা এই চাকরিটা না পেলে মানসীর সাথে সম্পর্কটা যে কোথায় দাঁড়াবে কে যানে। সব শালা ওই খানকীর জন্য। একটা বিজাতীয় ঘৃণা আর ক্রোধ জমে ওঠে অজিতের মনে। মনে হয় হাতের সামনে পেলে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে রুপ্সা বৌদিকে। রগদুটো দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে অজিতের। হারানদাকে চায়ের দামটা দিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে সে। পাশের দোকানটা থেকে মায়ের জন্য ঘুমের ওষুধ কেনে এক পাতা।
তিরিশ হাজার টাকা। দপদপানিটা কিছুতেই যায়না। মোড়ের দোকানটা থেকে সিগারেট কিনতে গিয়ে থমকায় অজিত। সামনেই শেলফে রাখা আছে ক্যাডবেরি। নেহা ক্যাডবেরি খুব ভালোবাসে। মোটা হয়ে যাবে বলে বাড়িতে মা ওকে খেতে দেয়না। স্কুল ছুটির সময় ক্যাডবেরি হাতে দাঁড়ালে নেহা জিতুকাকুর সাইকেলে চড়েই বাড়ি ফিরতে চাইবে। ঘোরে পড়া লোকের মতো যন্ত্রচালিত ভাবে ক্যাডবেরি কেনে অজিত।

***

কিছুতেই দুচোখের পাতা এক করতে পারেনা দশরথ। চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা কাটা হাত। তার এই ষাট বছরের জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা সয়েছে দশরথ। অনেক জায়গায় ধাক্কা খেয়ে এই মফস্বল শহরে এসে থিতু হয়েছে। আজ যেন সব কেমন টালমাটাল লাগছে। এই শহরেই চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গেছে দশরথের। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বোমাবাজি সবই দেখেছে। নকশাল আমলে বাচ্চা ছেলেগুলোর উপর পুলিশের অত্যাচার দেখেছে। তারপরে মোড়ে বাজারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোর বোমা হাতে মাস্তানি দেখেছে। ভেবেছিল, সব সয়ে গেছে। ওই কাটা হাতটা দশরথের বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক ওই রকম একটা কাচের চুড়ি ছিল পুঁটির। রেল কলোনির বাড়ীতে থাকার সময় ওই চুড়ি দেখে মেয়ের রেলে কাটা লাশ শনাক্ত করেছিল দশরথ। গত তিরিশ বছরের জীবন সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। আজ আবার সব ভেসে উঠছে।
গত দুদিন ধরে পুলিশ আর রিপোর্টারদের কাছে জবাবদিহি করে করে ক্লান্ত দশরথ। দুদিনে কি খেয়েছে, কোথায় ঘুমিয়েছে - কিছুই খেয়াল নেই। একটা ঘোরের মতো লেগে গেছে তার। ঘরের সামনে এসেও ঘরে ঢোকার ইচ্ছে হয়নি। এতক্ষণ রঘুর ঠেকে গোঁজ হয়ে বসেছিল এককোণে। ও ঠেকে কেউ ওকে চেনেনা তাই রক্ষে। ঠেক বন্ধ হবার থেকে ঘরের দাওয়ায় বসে আছে সে। কিই বা করবে ঘরে ঢুকে। একলা প্রাণি, পেটে খিদে নেই, চোখে ঘুম নেই। মেয়েটাকে চিনতে পেরেছিল দশরথ। রাজাবাগানের ভদ্রবাড়ির বাচ্চাটা। পুঁটিরই বয়সী হবে। ও বাড়ির সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শুনেছে সে। কিন্তু তাই বলে বাচ্চা মেয়েটাকে - । পুঁটি কি দোষ করেছিল? এরা কি মানুষ না দানব?
বস্তির একটা ঘর থেকে খিস্তি ভেসে আসছে। খোঁড়া কুকুরটা রাস্তায় শুয়ে আছে। আধখানা চাঁদ ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে। আর আধখানা অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর উপর। নিস্ফল আক্রোশে চাঁদটাকে খিস্তি করে ওঠে দশরথ। তারপর একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারে চাঁদের গায়। খোঁড়া কুকুরটা অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। দশরথের মনে হয় কুকুরটা এখুনি উঠে এসে জিজ্ঞেস করবে, ‘ঠিক কিভাবে লাশটা পেলে বলো তো...’
আর না। অনেক হয়েছে। আর কোনো উত্তর দেবেনা সে। আর কেউ পুঁটির কথা জিজ্ঞেস করার আগেই পালিয়ে যাবে সে। রাস্তা ধরে সামনে এগোয় দশরথ। কুকুরটা ওর যাবার পথের দিকে চেয়ে একবার ঘেউ করে। তারপর দুই থাবার মাঝে মুখ গুঁজে দেয়। চাঁদটা বিনা বাধায় মাঝ আকাশে উঠে যেতে থাকে। আর শহরের আরেক প্রান্তে টেবিলের উপর ঘুমের ওষুধ আর ক্যাডবেরির প্যাকেটের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অজিত।

জানুয়ারি, ২০০৭